উনিশে মে উদ্‌যাপন ও শহিদ-স্মারক উন্মোচন

উপলক্ষে প্রকাশিত

# ক্রোড়পত্র

২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

# ক্রোড়পত্র

## উনিশে মে উদ্‌যাপন ও শহিদ-স্মারক উন্মোচন

প্রকাশকাল : ১৯শে মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

**সম্পাদক–**

**রাজদীপ চন্দ**

আহ্বায়ক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোষ

রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

**প্রকাশক–**

অধ্যক্ষ

রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

# সূচিপত্র


- **পরিচালন সমিতির সভাপতির অভিভাষণ**
- **মুখবন্ধ**
- **সম্পাদকীয়**


## প্রবন্ধ:


১। মাতৃভাষার বিপন্নতা ও উনিশের চেতনা – সুধীর চক্রবর্তী

২। উনিশে মে : এক প্রতিবাদী সত্তা – রাজদীপ চন্দ

৩। ১৯শে মে : ভাষা শহিদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য – নীলাঞ্জন দে

৪। ডাকিতে সবাই কমলা/মাতা মোর মুখে দিয়েছিল সুখে/মধু সাথে ভাষা বাংলা - তনুশ্রী ঘোষ

৫। মাতৃভাষা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - দীপন ঘোষ

৬। বহুভাষিক রাষ্ট্রে সব ভাষার সহাবস্থান কামনা করতেই পারি – সুপেন্দ্র নাথ রায়

৭। ১৯শে মে : আমার উপলব্ধি – পারমিতা আচার্য

৮। ১৯শে মে ভাষা আন্দোলন : এক রক্তে লেখা ইতিহাস – পারমিতা দাসচৌধুরী

৯। ১৯শে মে’র ভাষাসংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত টীকাকৃত গ্রন্থপঞ্জি – সঙ্গীতা দাশ তালুকদার


## কবিতা:


১। বেঁচে থাক ভাষা – প্রজ্ঞা অন্বেষা

২। বাংলা – সুস্মিতা দাস

# পরিচালন সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

১৯শে মে বরাক উপত্যকার জনজীবনে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৬১ সালের এই দিনে যে গণজাগরণ ও গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা রক্তের বিনিময়ে এই উপত্যকাবাসীকে এনে দিয়েছিল মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। অধিকার সুরক্ষার সেই আন্দোলন আজও বহমান।

১৯শে মের পবিত্র দিনে বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যলয়ে একটি শহিদ স্মারক উন্মোচন হচ্ছে এবং এই উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হবে। আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে ভাষাসংগ্রামের গৌরবময় প্রেক্ষাপট পৌঁছে দিতে এবং এই আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমার ধারণা।

আমাদের সকল ভাষা শহিদ ও ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানীদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

**মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য**
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

# মুখবন্ধ

প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব এক ভাষাকেন্দ্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক বয়ান থাকে, যাকে কেন্দ্র করে তার জাতিসত্তার প্রলক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়। কিন্তু, কালস্রোতে, পরিবর্তিত সামাজিক চিত্রপটে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিও অনেকসময় ম্লান হয়ে যায়।

‘বঙ্গভূমিকা’ গ্রন্থের সূচনাতে সুকুমার সেন বলেছেন, “ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ।” এই সারকথাটিই বাঙালির আত্মপরিচয়ের মূলসূত্র। বাঙালি তার জাতিসত্তাকে বরাবরই এক বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্যানভাসে চিত্রায়িত করেছে যার মূল উপাদান দু’টি— মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি। মানচিত্রের গণ্ডিতে বাঙালি কখনও নিজেদেরকে সঙ্কুচিত করে রাখেননি। সেই বিচারে বাঙালির জাতিসত্তার এক সর্বজনীন অবয়ব সবসময়ই অস্তিত্বশীল থাকার কথা। কিন্তু, সময়ের কালস্রোতে, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বাঙালির আত্মপরিচয় আজ স্থান-কাল বিচারে আপেক্ষিক হয়ে পড়েছে! আর, ঠিক সেই কারণে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্কটও স্থান-কাল বিচারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিসর অনুসারে আজ পৃথক পৃথক।

সেরকমই এক পৃথক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে বা বলতে হয় আবর্তে বরাক উপত্যকার বাঙালি বেষ্টিত। এক ‘মমতাবিহীন কালস্রোতের’ শিকার। নিজের ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে, নিজের ভাষাগত অধিকার, মূলত আত্মপরিচয়, রক্ষার জন্য বারংবার প্রাণ দিতে হয়েছে উপত্যকাবাসীকে। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচরে ১১ জন বীর ভাষা শহিদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি রাজ্যভাষা আইনের সংশোধিত রূপ, পেয়েছি আমাদের (বরাক উপত্যকাবাসীর) ভাষাগত অধিকার। তারপর, ১৯৭২ সালের ১৭ই আগস্ট, ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই। কেবল বাংলা ভাষার অধিকারের জন্যই নয়, ১৯৯৬ সালের ১৬ই মার্চ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার অধিকারের জন্য একজন বীরাঙ্গনাকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে এই বরাক উপত্যকার মাটিতে। তাই এই মাটি শহিদের পুণ্যভূমি। এই মাটির রূপ-রস-গন্ধে মাতৃভাষাপ্রেম সম্পৃক্ত।

কিন্তু, জাতিসত্তার সর্বকালীন ও সর্বজনগ্রাহ্য রেখার উপর দাঁড়িয়ে এই ভূখণ্ডের যে বাঙালি তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছিল, সেই বাঙালি আজ অনেকখানি দিশাভ্রান্ত নয় কি? কালের স্রোতে, আমরা আমাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার পথ হারিয়ে ফেলেছি হয়তো, আর তাই হয়ে গিয়েছি প্রান্তিকায়িত। “বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়, বাহিরে তা কেমনে দেখাব।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিদায় অভিশাপ’ কবিতায় দেবযানীর প্রতি কচের এই উক্তিতে সুপ্ত ভাবাবেগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে এই উপত্যকার মাতৃভাষাপ্রেমী নাগরিকদের আজ দিন কাটাতে হচ্ছে।

তবে আশার রশ্মি যে একেবারেই নেই সেটাও বলা যায় না। যতই ক্ষীণ হোক, প্রয়োজন সেই রশ্মিকে প্রসারিত করা। সঙ্কোচনের অনুভূতি ও আপন চিত্তদৈন্য থেকে তৃতীয় ভুবনের এই বাঙালিকে বেরিয়ে আসতে হলে এই ভূখণ্ডের যুব-প্রজন্মকে হতে হবে অধিকার-সচেতন। শহিদের রক্ত-বিধৌত ভূভাগে সংগ্রামের অক্ষয়

## ক্রোড়পত্র ।। উনিশে মে উদ্‌যাপন ও শহিদ স্মারক উন্মোচন

নাড়ি থেকে যাদের জন্ম, লড়াই যে তাদের নিত্যদিনের কৃচ্ছ্রসাধন সেটা তাদের বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে, মনে করিয়ে দিতে হবে ভাষাই আত্মপরিচয়ের বাতিঘর। তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে, বিশ্বজনীন মানব-পরিচয়ের সঙ্গে বাঙালির আত্মপরিচয়ের কোনোদিন সংঘাত হয়নি। কারণ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে কখনও হাত মেলায়নি বাঙালি। এটাও বাঙালির আত্মপরিচয়ের আরেক অনন্য প্রলক্ষণ। নিজেদের আত্মপরিচয়কে পুনর্নির্মাণ করতে হলে বাঙালিকে সাংস্কৃতিক বহুত্ব এবং ধর্মীয় বহুত্বের ওপর আস্থাশীল হতে হবে, এই বহুত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখার পথে হাঁটতে হবে তাদের। সেই পথেই হবে প্রত্যাহ্বানের মোকাবিলা, এই পথেই হবে প্রান্তিকায়ন থেকে মুক্তি। এই ছাত্র-যুব প্রজন্মের মধ্যে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত করতে **১৯**শে মে-র চেতনা সঞ্জীবনীর কাজটুকু করবে। ‘**১৯**’ তাদের দীপ্তকণ্ঠে ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা' বলার উৎসাহ ও সাহস যোগাবে।

এই উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশায় আমাদের শিক্ষালয়ে স্থায়ী শহিদ স্মারক নির্মাণ। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আত্মবলিদান দেওয়া বীর ভাষা শহিদদের গৌরবগাথা অক্ষয় করে রাখতে, বরাক উপত্যকার বহমান ভাষাসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে নব-প্রজন্মের ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরে তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে এই উদ্যোগ।

এই শহিদ স্মারক নির্মাণে কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী, পরিচালন সমিতির সদস্য-সদস্যা, প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, কার্যালয় কর্মচারী ও ছাত্রীরা আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই উপলক্ষটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোষ একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের সাধু উদ্যোগ নিয়েছে, এই সমিতির সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সেইসঙ্গে, যারা নিজেদের রচনা দিয়ে এই স্মারক-পুস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এতে সন্নিবিষ্ট নিবন্ধ, কবিতাগুলি ছাত্রীদের উদ্বোধিত করবে, এই প্রত্যাশা।

পরিশেষে, বহমান ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস নব-প্রজন্মের জন্য হোক আগামী পথচলার অনুপ্রেরণা। তারা আত্মদীপ হয়ে জ্বলে উঠুক, আলোকিত করুক উপত্যকার সমাজমনকে।

**সব্যসাচী রায়**
অধ্যক্ষ

# সম্পাদকীয়

"আমি চাই সাঁওতাল তার ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে/ আমি চাই মহুল ফুটবে শৌখিনতার গোলাপ কুঞ্জে/ আমি চাই নেপালি ছেলেটা গিটার হাতে/ আমি চাই তার ভাষাতেই গাইতে আসবে কলকাতাতে"- মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের প্রথম মাধ্যম, তার আত্মপরিচয়ের স্তম্ভ। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কারণে নানা সময়েই মানুষ তার মাতৃভাষা চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু এই বঞ্চনার ইতিহাসের পাশাপাশি কখনও আবার লেখা হয় স্পর্ধার ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। তেমনই এক সংগ্রামের নাম উনিশে মে। **১৯৬১** সালের এই দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার রক্ষার্থে বরাক উপত্যকার শিলচর শহরে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন **১১**জন বীর শহিদ। এখানেই শেষ নয়। **১৯৭২** এবং **১৯৮৬** সালে আবারও মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন আরও তিনজন বীর ভাষা সেনানী। **১৯৯৬** সালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার অধিকার আদায় করতে প্রাণ উৎসর্গ করেন আরও একজন। উনিশে মে এই প্রতিটি সংগ্রামকে ফিরে দেখবার দিন। ইতিহাসকে পাথেয় করে কাঙ্ক্ষিত আত্মপরিচয়ের খোঁজে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়ার দিন।

বীর ভাষা-সেনানীদের স্মৃতিতে এবছর আমাদের মহাবিদ্যালয়ে স্থায়ী শহিদ স্মারক উন্মোচন করা হবে। সেই উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে উনিশের চেতনা ও মাতৃভাষার অধিকার কেন্দ্রিক কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা দিয়ে আমরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কোষের পক্ষ থেকে এই ক্রোড়পত্রটি সাজিয়েছি। ক্রোড়পত্রটি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা নতুন প্রজন্মকে প্রাণিত করলে সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত শহিদ-তর্পণ।

**রাজদীপ চন্দ**
আহ্বায়ক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোষ
রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

# মাতৃভাষার বিপন্নতা ও উনিশের চেতনা

**সুধীর চক্রবর্তী**
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

যে ভাষায় আমরা প্রথম আধো আধো কথা বলি, যে ভাষার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রথম বর্ণ পরিচয়, বস্তু পরিচয় বা প্রকৃতি পরিচয় ঘটে, বা যে ভাষার সাহায্যে আমরা কল্পনার পৃথিবী তৈরি করি, তাই আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষাই আমাদের চিন্তা বা মননের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। তাই অনেক মনীষী মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে থাকেন।

আমরা যখন মাতৃভাষার পাশাপাশি বৃহত্তর পরিসরে বিদেশি সাহিত্য চর্চা করি, সেই ভাষা অর্থবহ হয়ে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই, যখন মনের গভীরে অনুবাদ প্রক্রিয়া কাজ করে ও মাতৃভাষায় সেই ভাষাকে আমরা অনুবাদ করি। অথবা যখন কোনো দুর্বোধ্য তত্ত্বকে আমরা নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করি। ভেতরের অন্তর্নিহিত অর্থটা মাতৃভাষাতেই মনে ধারণ করার প্রয়োজন অনুভব করি। বস্তুত আমাদের অন্তরের গভীর ভাবনা, মনন, উপলব্ধি, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একমাত্র মাতৃভাষার দ্বারাই সম্ভব।

আজকাল 'ভাষিক আগ্রাসন', 'ভাষিক বিপন্নতা' ও 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ' – এই শব্দবন্ধগুলো খুবই পরিচিত। আজ আমরা বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতিতে অবস্থান করছি। নিজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ছেড়ে অন্যের চোখে নিজেকে প্রতিনিয়ত উদারমনা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা যেমন আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা শিখতে বাধ্য, তেমনি পেশাগত কারণে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করতেও সর্বদা যত্নশীল। নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা জীবিকা নির্বাহের একটা উপকরণমাত্র; জীবনের সঙ্গে সেটা মোটেই সম্পৃক্ত নয়।

আমাদের দ্বিচারিতাও মাতৃভাষার সঙ্কটের একটা কারণ। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উচ্চবিত্ত অভিভাবকের একটা বড় অংশ মুখে যদিও ভাষার বিপন্নতার কথা বলেন, কিন্তু নিজের ছেলে ও মেয়েদেরকে তারা নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং বিদেশি আদবকায়দা রপ্ত করতে উৎসাহিত করেন। এমনকি শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও বিদেশি রীতিনীতিকে তারা শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেন।

তাছাড়া, আরেকটা দিক হল সংখ্যালঘু ভাষিক সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু ভাষাগোষ্ঠীর আগ্রাসন বা আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে এই আগ্রাসনের যন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছেন। নিত্যদিনের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি তারা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ সংখ্যালঘু ভাষিক সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজও এই আগ্রাসনের শিকার। বাংলা ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্যে এই উপত্যকার বাঙালি জনগণকেও রক্ত ঝরাতে হয়। শহিদ হতে হয়। ১৯শে মে আমরা ভাষা শহিদ দিবস

পালন করি ও রক্তস্নাত দিনটিকে স্মরণ করি। এই দিন ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় সাড়ে ছয় দশক আগের ঘটনা আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে ও আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়। তাই ১৯শে মে আমাদের কাছে বাঙালির আত্মগৌরব ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। কিন্তু এই শহিদ তর্পণকে শুধুমাত্র বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। ভাষাসংগ্রামের সঠিক ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে উনিশের চেতনার বীজ যাতে অঙ্কুরিত হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

মাতৃভাষায় কথা বলা যেমন আমাদের অধিকার, তেমনি এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের কর্তব্যবোধ জেগে উঠুক। আমরা যেন আবারও নতুন করে প্রাণিত হই।

ভাষাসংগ্রামের সেনানীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

# উনিশে মে : এক প্রতিবাদী সত্তা

**রাজদীপ চন্দ**

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

বরাক উপত্যকার জনজীবনে উনিশে মে এক প্রতিবাদী সত্তা যা বরাকবাসী তথা আপামর বাঙালির চিন্তন ও মননে গভীর ছাপ রেখে গেছে যা আজও অব্যাহত। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভাজন ও শ্রীহট্ট গণভোটের মতন কালিমাময় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সিলেট জেলার তদানীন্তন আসাম প্রদেশ থেকে বিতাড়ন এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির উপর গভীর ছাপ রেখে যায়। ভাষাকে কেন্দ্র করে উপনিবেশ-উত্তর ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা তৎকালীন আসামে ভাষা সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলে। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাংলা ভাষাভাষী জনগণের একটি বিশাল অংশ যখন আসামে আশ্রয় নেন, শুরু থেকেই তাদেরকে নানা ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। অস্তিত্বের সংকট ও ভাষিক আগ্রাসন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলে। অন্যায় ও ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বরাকবাসী ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করেন। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও নিষ্পেষণ জনজাগরণের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং এখান থেকেই প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা পরবর্তীকালে বরাক উপত্যকায় ভাষাভিত্তিক গণআন্দোলনের জনজোয়ার নিয়ে আসে।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ভাষাভিত্তিক সমস্যায় যখন তৎকালীন আসাম প্রদেশ জর্জরিত ঠিক সেই সময় ১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর রাজ্যভাষা বিল উত্থাপিত হয় এবং এই ভাষা বিলের বিরুদ্ধে তৎকালীন কাছাড় জেলার সদস্যবর্গ আসাম বিধান পরিষদীয় সভায় তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। ভাষা বিলের প্রতিবাদে বরাক উপত্যকা গর্জে উঠে এবং বরাকের বিভিন্ন জাতি ও ভাষিক গোষ্ঠীর জনগণ নিজ নিজ মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে হাতে হাত মেলান এবং অবিচল চিত্তে গণ সংগ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করেন। ভাষাসংগ্রামীরা বরাকের আপামর জনসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ

সযত্নে হাতে তুলে নিলেন এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের নিজ নিজ ভাষিক অস্তিত্ব ও মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার প্রশ্নে বরাকবাসীকে সচেতন ও অনুপ্রাণিত করে তুললেন। ভাষা-সেনানীরা তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও উজ্জীবিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গণ আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে মিছিল সভা ও পদযাত্রাকে বেছে নিয়েছিলেন। তদানীন্তন কাছাড় জেলার তিন মহকুমা যথাক্রমে শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জনজাগরণ ও গণআন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যায়। উপেক্ষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত বরাকবাসীর মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার প্রশ্নে গঠিত হয় কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ ‘জান দেবো, তবু জবান দেবো না’ এই বাণীর মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। কাছাড় জেলা গণ সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পয়লা বৈশাখ দিনটি সারা জেলায় ‘সংকল্প দিবস’ রূপে পালিত হবে। একই সঙ্গে, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সময়কাল সভা, সমিতি ও পদযাত্রার মধ্য দিয়ে উপত্যকাব্যাপী গণ সচেতনতা গড়ে তোলা হবে।

অবশেষে চলে এলো সেই চরম নির্ণায়ক মুহূর্ত, ১৯শে মে। বরাকের পুণ্যভূমি রক্তস্নাত হল তারই সন্তানের রক্তে। সমগ্র বরাক উপত্যকা নারকীয় নৃশংসতা ও হত্যালীলার সাক্ষী হয়ে রইল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার এক মাসের মাথায় ১৯শে জুন শহিদের চিতাভস্ম বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভাষাসংগ্রামের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রশাসনিক স্তরে এর সুবিচারের আশ্বাস দেওয়া হলেও সেটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য মেহরোত্রা কমিশন গঠিত হলেও সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। মাতৃভাষার সুরক্ষার প্রশ্নে বরাক উপত্যকার ভাষা সৈনিকরা যে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন সেই অধ্যায় আজও বরাকের জনজীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ভাষিক আগ্রাসন একটি ভাষাভিত্তিক গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনকে পদপিষ্ট করার প্রয়াস চালিয়েও চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এই গণআন্দোলন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। বিভাজনের রাজনীতি শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে বরাক উপত্যকায় বারবার ভাষিক আগ্রাসনের মুখে পড়তে হয়েছে। ১৯৬১ তে যে প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে যখন বাংলা ভাষা-সেনানী বাচ্চু চক্রবর্তী এবং জগন্ময় দেব (জগন) ও দিব্যেন্দু দাস (যীশু) আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার অস্তিত্বকে রক্ষা করেছিলেন।

মহান উনিশে মে’র প্রেক্ষাপট ও ঘটনাপ্রবাহ আজও তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। মাতৃভাষার অধিকারের প্রশ্নে সবাইকে হতে হবে আপোষহীন। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জনমত গঠন ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার কাজ অবিরামভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ১৯শে মে দিনটি শুধুমাত্র সভা, সমিতি ও আলোচনাচক্র আয়োজনের মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। মাতৃভাষার সুরক্ষার প্রশ্নে হতে হবে অতন্দ্র প্রহরী। বরাক উপত্যকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে এবং একই সঙ্গে আগামীদিনে সম্ভাব্য ভাষাকেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং

একইসঙ্গে বরাক তথা দেশের বহু ভাষিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এখানেই উনিশে মে'র উপলব্ধি ও সার্থকতা নিহিত।

# ১৯ মে: ভাষা শহিদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

**নীলাঞ্জন দে**
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ভাষা মানুষের পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পৃথিবীতে বহু আন্দোলন হয়েছে, বহু আত্মত্যাগ ঘটেছে। বাংলাদেশের বাহান্নর (১৯৫২) ভাষা আন্দোলনের বীরগাথা যেমন বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, তেমনই ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার ১৯ মে-র ভাষা শহিদ দিবস এক রক্তস্নাত অধ্যায়, যা মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। এই দিনটি কেবল একটি তারিখ নয়, এটি একটি চেতনার নাম, একটি সংগ্রামের স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।

১৯৬০ সাল। আসাম সরকার সমগ্র রাজ্যে একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বরাক উপত্যকার বাংলাভাষী জনগণ। তৎকালীন কাছাড় (বর্তমান কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি) জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। জন্মলগ্ন থেকে যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে ভাষায় তাদের স্বপ্ন বোনা, সেই বাংলাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষাকে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং বাংলাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে শুরু হয় গণআন্দোলন।

আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল "কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ"। বিভিন্ন সভা, সমিতি, মিছিল ও মিটিংয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৬১ সালের ১৪ এপ্রিল পালিত হয় 'সংকল্প দিবস', যেখানে বাংলা ভাষার জন্য সর্বস্ব পণ করার শপথ নেওয়া হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় আন্দোলন আরও তীব্রতর রূপ নেয়। অবশেষে ১৯ মে সমগ্র বরাক উপত্যকায় হরতাল ও সত্যাগ্রহের ডাক দেওয়া হয়।

১৯৬১ সালের ১৯ মে ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। সকাল থেকেই শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে অংশগ্রহণ করে। সরকারি অফিস, আদালত, রেল স্টেশনসহ সর্বত্র পিকেটিং চলতে থাকে। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলেন। তাদের কণ্ঠে ছিল মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের স্লোগান। বেলা বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। আসাম রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয়। শান্তিপূর্ণ জমায়েতের ওপর প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। নিরস্ত্র মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয় শিলচর স্টেশনের মাটি। পুলিশের গুলিতে একে একে লুটিয়ে পড়েন এগারোজন ভাষাসৈনিক। তারা হলেন: কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রকুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ ও কমলা ভট্টাচার্য ।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা বরাক উপত্যকা তথা বাংলাভাষী অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। ২০ মে শহিদদের মরদেহ নিয়ে এক বিশাল শোকমিছিল শিলচর শহর পরিক্রমা করে, যা প্রতিবাদের আগুনকে আরও প্রজ্বলিত করে তোলে।

এই আত্মত্যাগের কাছে অবশেষে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় আসাম সরকার। বরাক উপত্যকায় বাংলাকে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে "ভাষা শহিদ স্টেশন, শিলচর" রাখা হয়েছে, যা সেই ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯ মে ভাষা শহিদ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়:

**মাতৃভাষার অধিকার:** মাতৃভাষায় কথা বলা, শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করার অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

**ঐক্য ও সংহতি:** ভাষার প্রশ্নে বরাক উপত্যকার মানুষ যে ঐক্য ও সংহতির নজির সৃষ্টি করেছিল, তা আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বাংলা ভাষার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন।

**আত্মত্যাগের মহিমা:** ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে বিরল। ১৯ মে-র শহিদেরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

**অন্যায় ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ:** যেকোনো অন্যায় ও ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয় এই দিনটি। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমেও যে অধিকার আদায় করা যায়, তার প্রমাণ বরাকের ভাষা আন্দোলন।

**সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ:** এই আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি ছিল বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস।

প্রতি বছর ১৯ মে বরাক উপত্যকা-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি সম্প্রদায় গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ভাষা শহিদ দিবস পালন করে। শহিদদের স্মরণে প্রভাতফেরি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দিনটিতে নতুন করে শপথ নেওয়া হয় মাতৃভাষা চর্চা ও প্রসারের।

১৯ মে শুধু একটি শোকের দিন নয়, এটি আত্মমর্যাদা ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই দিনটি আমাদের শেখায়, ভাষার প্রতি মমতা এবং তার সম্মান রক্ষার্থে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারির মতোই উনিশে মে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, ততদিন এই শহিদদের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং আমাদের পথ দেখাবে। তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করে মাতৃভাষার প্রতি আরও যত্নশীল

হওয়া এবং তার সমৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হওয়াই হবে ১৯ মের শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো। তাঁদের অমর স্মৃতির প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

## ডাকিতে সবাই কমলা/মাতা মোর মুখে দিয়েছিল সুখে/মধু সাথে ভাষা বাংলা

**তনুশ্রী ঘোষ**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

“পথিক তুমি কি বাঙালি?/তবে শোনো বলি/অমরাপুরীর কথা/সেই পথে গেলে/ অমৃতেরে মেলে/না থাকে মরণ ব্যথা/আমি তোমাদের বোন/বয়সে নতুন/ডাকে সবাই কমলা/মাতা মোর মুখে /দিয়েছিল সুখে/মধু সাথে ভাষা বাংলা/ওই ওইখানে/রেল ইস্টিশনে/ওই যে সে বরাক তীরে/সত্যের সনে/ পশুবল রণে /পশুরা গিয়েছে হেরে।”------ আজকেও উনিশ আমাদের ভাববার অবকাশ রাখে এই কারণে যে, এর প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া ষড়যন্ত্র আমাদের বাঙালি সত্তাকে আহত করেছে ১৯৫১, ১৯৫৫ র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংগঠিত বঙ্গালখেদা আন্দোলন আমাদের মনে করায় অনসমিয়া গঠনের চক্রান্ত কি নিদারুণভাবে আমাদের শৈক্ষিক ও আর্থিক পরিসরে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু অনবরত গজিয়ে উঠা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র অভিভাবক সংস্কৃতিকর্মীর কাছে উনিশ কি শুধু দামি পাঞ্জাবি, রজতশুভ্র শাড়ি, আলোয়ান পরিধান করার ও খোপায় কৃষ্ণচূড়ার ফুল গেঁথে শক্তিপদর কবিতা আবৃত্তির দুপুর!! নাকি শম্ভুসাগরের কোণে অস্থায়ী মঞ্চে বসে বেদম দম ধরিয়া আবৃত্তির দিন উনিশ :-----"যে কড়েছে বাস্ত ভিটে/সেই কেড়েছে ভয়/আকাশ জুড়ে লেখা আমার/আত্মপরিচয়/বাংলা আমার আই ভাষা গো/বিশ্ব আমার ঠাই/প্রফুল্ল ও ভৃগু আমার/খুল্লতাত ভাই। " দিন দিন শহিদ দিবস পালনের তোড়জোড় বাড়ছে, আঁকিয়ে গন্ধর্ব কিন্নর নর্তক সকলেই আসে কিন্তু স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের একসাথে একাদশ শহিদের নাম বলতে বললে তারা পারবেন না। এইতো হকিকত। তাহলে কি এই কথা সত্য যে--"শহিদের বেদীপটে জ্বলে ওঠে ক্রোধ অভিমান/তারপর কবিতায় ভাসিয়ে শহর/যার যার চলে যায় টান টান শোয়/দগ্ধ হয়ে ক্ষুদ্রতার বেড়াজালে আটকে নির্মোক!" সকালে উঠেই শুরু হয় আমাদের এই উপনিবেশিকৃত মনের মানুষের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সিংহ দুয়ারের দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে দৌড়ঝাঁপ। কারো ছেলেমেয়ে যেন বাংলা পড়তে পারে না, পারে না সঠিক উচ্চারণে পদ্মপুরাণ পড়তে, জানে না হেম-নবীন-মধু-রবির কথা। তারাশঙ্করের ‘বেদেনী’ অথবা মানিকের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, রবীন্দ্রনাথের ‘খাতা’, শরতের ‘মহেশ’ অথবা বিভূতির ‘ইছামতীর’ পাঠক তৈরি হচ্ছে না বাঙালি ঘরে। আমরা যারা উনিশ উনিশ করি আমাদের ছেলেমেয়ে বাংলা পড়তে নিমরাজি। আমাদের ভাববার ভাষা, বলবার ভাষা, লেখবার ভাষা আলাদা হয়ে গেছে। আর কি তৈরি হবে না কমলা? কমলা যে এখনো বলে--"চিতায় আগুন জ্বেলে দে মা/গর্জে উঠুক ধুম।" তবে কি আমরা শুধু উৎসবের দিন বৃহৎ!! এই দ্বিচারিতা এই দ্বন্দ্ব নিয়ে দেশভাগের খণ্ডিত দ্বিধা বিভক্ত বাঙালি এখন পশ্চিমী সভ্যতার দিকে ক্রমধাবমান । দুটো ছাত্রসমাজ তৈরি হয়েছে একটা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের এবং অপরটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের। এর মাঝখান দিয়ে আসে উনিশ কবির শহরকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের শিরদাঁড়ায় একটা প্রচণ্ড আঘাত আসে সত্যিই আমরা বাঙালি!

'আয়রে বাঙালি, আয় সেজে আয়/আয় লেগে যাই দেশের কাজে/দেখাই জগতে ভেতো বাঙালি/দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে'।  মা বলতো উনিশের গল্প সেই সকালবেলার কথা যখন সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সকলের জমায়েত হয়েছিল রেল স্টেশনে। সেদিনের শচীন্দ্র বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "ভাই সব যেও না, বুকে গুলি নাও ।" সেদিন মায়ের বুকেও লেগেছিল লাঠির আঘাত তখন তারা স্কুলের ছাত্রী। সেদিন ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু ছেড়ে সকলেই গেছিলেন সংগ্রাম পরিষদের ডাকে। অনুপ্রেরণা জুগিয়ে ছিল ১৯৫৩-র ভাষা আন্দোলন। 'রফিক শফিক বরকত নামে/ বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে/ স্বদেশের মাটি রঙিন করেছে/ আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে'। বিমলা প্রসাদ চালিহা বদরপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন ও অনসমিয়া জনগণের জন্য অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার উৎসাহ যোগান। উনিশে মে গুলি চালানোর স্বপক্ষে খুনি পুলিশবাহিনী বলেছিল যে উগ্র জনতার আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের গুলি চালাতে হয়। পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে মেহেরোত্রা তদন্ত কমিশন বসে। একাদশ শহিদ আমাদের হৃদয়ে যে  চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে তা আমাদের ঐতিহ্যের শিকড়কে করেছে মজবুত। একটি মেয়ে তাই চিঠি লিখেছেন, বাবা আমিও যদি শহিদ হতে পারতাম। ভাষাজননীর পায়ে আমারও যদি স্থান হতো। ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে মরতে পারলাম না। তখন প্রত্যেকদিন সকালবেলা প্রভাতফেরি হত এবং সকলে গাইতেন, 'ডাকে ওই একাদশ শহিদের ভাই আর দেরি নয় আর দেরি নয়'। আজ মনে পড়ে ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে লেখা কানু আইচের কথা  এতখানা কাজ করবার পর স্বীকৃতি পাননি বলে আফসোস করেছিলেন সাংবাদিক এই ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সংসারে ছিল তার বসবাস। করিমগঞ্জের যুগশক্তি পত্রিকা সেই সময় অগ্রণী ভূমিকা নেয়। শ্রদ্ধেয় ঋষিন মিত্র কলকাতার দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উনিশকে। তৎকালীন এক সাপ্তাহিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী সেই সময় এত বড় শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশ আগে কখনো শহরবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। মিছিলে স্লোগান ছিল,... কাছাড়ের প্রতিনিধি বিমলা প্রসাদ চালিহার পদত্যাগ চাই। কথা প্রসঙ্গে চালিহার ফাঁসি নিয়ে নাটকের একটা কাল্পনিক গল্প উঠে আসে। গোপা ভরদ্বাজ হয়েছিলেন জজ এবং একজন হয়েছিল চালিহা। সেটা একটা অভিনয় ছিল কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মানুষের আক্রোশ প্রকাশিত হয়। মানুষের মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়ার সেই চক্রান্ত কি মেনে নিতে পারে বাঙালি যে কিনা কিছুদিন পূর্বে ঘরবাড়ি ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসে উঠেছিল বরাকের বুকে। আর যার লোহিতে লুকিয়ে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরাধিকার সেই বিজয়ী বাঙালি। যারা লড়তে জানে মরতে জানে তারা তাই সেদিন মেনে নিতে পারেনি বঞ্চনার-লাঞ্ছনার অপমানকে। যে বাঙালি চর্যাপদের যুগে বলেছিল—'কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল ...' সে তো আর্য আগমনের পূর্ব থেকে এই দেশের এই মাটির তার গাত্রবর্ণ তাইতো প্রমাণ দেয়। তবে কি করে সে আবার নতুন কলেবরে সাজবে যার হাতে আছে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিরাট ঐতিহ্য।

# মাতৃভাষা : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

**দীপন ঘোষ**
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

প্রথমেই বলছি এই লেখাটি কোনো গবেষণাধর্মী রচনা নয়। বাংলা ভাষায় আমার জ্ঞান খুব সীমিত। তবে মাতৃভাষার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও টান দুটোই অসীম। এই টানের কথা মাথায় রেখে দু'চারটি বাক্য লেখার সাহস করছি। কারণ বর্তমানে আমি বাংলা ভাষায়(মাতৃভাষা) চিন্তা করি এবং ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করি। ইংরেজি ভাষা বা অন্য কোনো ভাষাকে আমি ছোটো করছি না।

মাতৃভাষা মায়ের ভাষা। অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা কথা বলি, নিজের অনুভূতি প্রকাশ করি ও চিন্তা করি। যখন আমরা অন্য কোনো ভাষা(দেশি বা বিদেশি) নিয়ে চিন্তাচর্চা করি তখন অবচেতন মনে মাতৃভাষায় আমরা তা প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করি। মাতৃভাষা শুধু একটি ভাষা নয়, তার সঙ্গে সমাজব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা চূড়ান্ত পর্যায়ে(বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে)। সময়ই বলে দেবে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা। আগামী প্রজন্মের নিজের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, ভাষার প্রতি আনুগত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুভূতি এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। সময়ের দাবীতে বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি মাধ্যম) শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার দরুন বোধশক্তির অবক্ষয়, চিন্তাশক্তির নিম্নগামীতা এবং উৎকর্ষ বিকাশের মন্দাবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজার অর্থব্যবস্থায় মাতৃভাষায় চিন্তাচর্চা অথবা শিক্ষাব্যবস্থা কি নিয়মের পরিপন্থী? নাকি আমরা বোধশক্তি হারিয়ে অজান্তেই বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশি ভাষার (ইংরেজি) প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশ করছি? আমার বিশ্বাস বিশ্বায়নের প্রভাবে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন যদি সময়ের দাবী হয় তাহলে মাতৃভাষার প্রতি (বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে) হেয় মনোভাব দেখানো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। কারণ শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করা নয়, শিক্ষা হল বোধশক্তির বিকাশ। এবং এই বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই হল একমাত্র অবলম্বন। একজন শিক্ষার্থী বা গবেষক নিজের মাতৃভাষায় চিন্তা করতে পারে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় চিন্তাচর্চা অবশ্যই প্রয়োজন। মাতৃভাষা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রায় অসম্ভব। মাতৃভাষা না জানা বা মাতৃভাষাকে (আমাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা) হেয় প্রতিপন্ন করা ফ্যাশন হতে পারে না। বাঙালি সমাজের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তথা প্রথিতযশা মানুষেরা কিন্তু বাংলাভাষাকে (মাতৃভাষা) সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসুরা বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা থেকে শুরু করে নানা লেখালেখি করেছিলেন।

এই পটভূমিতে মাতৃভাষায় চিন্তাচর্চা, মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, সমান মর্যাদা প্রদর্শন, আনুগত্য স্বীকার করাই হবে ভাষা শহিদের প্রতি প্রকৃত অর্থে আমাদের সম্মান প্রদর্শন। ভাষা শহিদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শুধু পালন করলে হবে না বরং মাতৃভাষাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে। মাতৃভাষাকে নিজের মননে এবং স্বপনে স্থান দিতে হবে। ভাষা শহিদের এবং ভাষা-সেনানীদের আত্মবলিদান

যেন আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয় এবং আমাদের সবার মনে(পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষের মনে) শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটে এই প্রত্যাশা করি। সেইসঙ্গে পৃথিবীর সকল ভাষা শহিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বিশ্বদরবারে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে **১৯৬১** সালের **১৯** মে বরাক উপত্যকায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। এঁরাই হোক আমাদের আগামীদিনের পথচলার প্রেরণা।

## বহুভাষিক রাষ্ট্রে সব ভাষার সহাবস্থান কামনা করতেই পারি

**সূপেন্দ্র নাথ রায়**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যে কোনো জাতির প্রাণ বা আত্মা প্রোথিত থাকে তার ভাষা ও কৃষ্টির মধ্যে। ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিটি জাতির দুর্বল জায়গা, আবেগের জায়গা। আর এর জন্য প্রাণ দিতেও আমরা প্রস্তুত। বরাক উপত্যাকায় **১৯** মে-র প্রেক্ষিত তো এভাবেই তৈরি হয়েছিল। বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আগ্রাসনের ফলশ্রুতিই হল **১৯** মে। শাসকের চূড়ান্ত আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার দরুন সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল **১১**জন বাঙালিকে। তবে সেদিনের আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলা ভাষার আন্দোলন ছিল না। নাবালিকা কমলা ভট্টাচার্য ও কানাইলালরা সেদিন আসলে পৃথিবীর সমস্ত ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী পৃথিবীর সমস্ত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই এক কঠোর বার্তা ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা। এজন্যই তো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা **১৯** মে পালন করি। শচীন্দ্র, কুমুদ, সুকোমলদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

কিন্তু আজ যখন প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও **১৯** মে উপলক্ষে এই প্রতিবেদন লিখছি তখন মনের কোণে একে একে উঁকি দেয় অসংখ্য জিজ্ঞাসা। আজ থেকে ৬৪ বছর পূর্বে যে উদ্দেশে হিতেশ, চণ্ডীচরণ, সত্যেন্দ্র, বীরেন্দ্ররা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? শাসকগোষ্ঠী কি ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে? না, একেবারেই নয়। এই বিশ্বায়ন আর মুক্তবাজার অর্থনীতির দুনিয়ায় আগ্রাসনের মাত্রা বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। পুঁজিবাদ, মৌলবাদ আর শাসকগোষ্ঠী এই ত্রিফলার চাপে বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাও আজ অস্তিত্বের সংকটের শিকার। অর্থাৎ এযুগে ভাষিক আগ্রাসনের বহুমাত্রা প্রতীয়মান। সূক্ষ্মভাবে না তাকালে আজকের দিনে শাসকগোষ্ঠীর ভাষিক আগ্রাসনের কূটনীতি অনুধাবন করা অসম্ভব। তবুও কখনো কখনো আগ্রাসনের মাত্রা এতটাই জোরালো হয়ে ওঠে যে তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় শাসকগোষ্ঠীর হিংস্র দাঁত-নখ। সাক্ষী বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা ভাষা। দৃষ্টান্ত ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাঙালিকে হেনস্থা করা। সংকট আরও আছে, ভীতির কথাও আছে। এসব নোংরামোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে কই? প্রশ্ন হচ্ছে কোথায়? বড়ো কথা আমরা একত্র হতে পারছি কই? ভাষার চেয়ে ধর্মীয় পরিচয়টাই কি প্রাধান্য পাচ্ছে না? আমরা নিজেরাও কি দায়ী নই? আমরা আজও কি পেরেছি ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে? তা না হলে কেন আমরা

মায়ের ভাষায় লিখতে-পড়তে আগ্রহী নই। মায়ের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে আটকে পড়ি, লজ্জা পাই। সুতরাং আজকের ভুবনে ভাষা সংকটের উৎস-সূত্র আরও গভীরে প্রোথিত। এই সংকট থেকে উত্তরণের প্রেরণা নিতে আমাদের ফিরে যেতেই হবে ১৯ মে-র ভাষা শহিদের কাছে। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা ও ভাষিক গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জীবনপ্রবাহকে মসৃণ করে তোলার জন্য বরাক উপত্যকার একাদশ ভাষা শহিদের আদর্শকে হাতিয়ার করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ১৯ মে-র পবিত্র দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে আমরা যেন পৃথিবীর সব ভাষা ও ভাষিক গোষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, রাজবংশী, কন্নড় ইত্যাদি ভাষা যদি একসাথে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যায় তার চেয়ে সুদৃশ্য তো আর কিছু হতে পারে না। বহুভাষিক রাষ্ট্রে এই চিত্র তো আমরা কামনা করতেই পারি। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো ভারতকে চেনা যায়। এভাবে সব বিরোধ আর বৈষম্যকে দূরে সরিয়ে রেখে যেদিন সত্যিই ভারতের সব ভাষা ও ভাষিক গোষ্ঠী একত্রে সহাবস্থান করতে পারবে সেদিন যথার্থই সার্থক হবে একাদশ ভাষা শহিদের আত্মবলিদান। সেদিনই হবে তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন।

## ১৯শে মে : আমার উপলব্ধি

**পারমিতা আচার্য**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মাতৃভাষা -- আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের হয়ে ওঠা, আমাদের জীবনের মূল সুর। আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবনকে সবচেয়ে সহজ ও সুন্দরভাবে জানার অন্যতম মাধ্যম। ছোট ছোট সাধারণ বার্তালাপ থেকে শুরু করে জ্ঞানের অসীম অতল গহনতা নিরূপণের সহজতম মাধ্যম আমাদের মাতৃভাষা।

অথচ আজ, বিশ্বায়নের যুগে, আমাদের জীবনের নির্যাসটুকু বহন করে যে ভাষা, সেই বাংলা ভাষাই চরম সঙ্কটাপন্ন। বর্তমানে প্রতিদিনের জীবনে বাংলায় কথা বলাটাও যুবসমাজের কাছে যেন অপছন্দের। দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়ে, কর্মক্ষেত্রে, হাল্কা আড্ডার আসরে, গুরুগম্ভীর আলোচনায় – সর্বত্রই কথোপকথনে বাংলাভাষার বদলে হিন্দি বা ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ার মত। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সময়ের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক, স্থানিক, বা ভাষিক গণ্ডি আজ অনেকটাই মুছে গিয়ে আমাদের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে। যা বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত জীবন স্পন্দনের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সংযোগকে পুনর্গঠনের বিস্তৃত সুযোগ এনে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রভাব। যা ব্যক্তি জীবনে, আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে, এমনকি সার্বিকভাবে দেশের উন্নতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এরই ফলশ্রুতি হিসেবে জীবনযাত্রায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে আমাদের ভাষিক চেতনায়। কথা বলার আঙ্গিক গেছে অনেকটাই বদলে। এমনকি, বর্তমানের সাহিত্যিক ভাষাতেও এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। আসলে সাহিত্য তো মানবজীবনকেই প্রতিফলিত করে। ফলে যাপনের গতি যেখানে অভিমুখ বদলায় সেখানে সাহিত্যিক বিনির্মাণও স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যায়।

পরিবর্তন জীবনের মূল সূত্র হলেও, সেই পরিবর্তন বহিরঙ্গ জীবন পটভূমিতেই কাম্য। অন্তরেও সে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগুক বটে, কিন্তু নিজের সত্তা ভুলে গিয়ে যদি পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া যায়, আখেরে নিজেরই আত্মবিনাশের কারণ হয়ে উঠতে হয়। আমরা বাঙালি। আমাদের ভাষা বাংলা। কিন্তু বড় দুঃখের সঙ্গে এটা স্বীকার করতে হয় যে আজ আমরা যেন আত্মবিস্মৃত। নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি থেকে আমরা আজ বহু যোজন দূরে সরে গিয়ে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে আধুনিক হওয়ার জোয়ারে গা ভাসিয়েছি। আধুনিকতাকে আপন সত্তা বিসর্জন দিয়ে অর্জন করলে অবশ্যম্ভাবী 'আত্মবিলাপ' এবং আত্মদহনের হাত থেকে না ব্যক্তিগত স্তরে মুক্তি লাভ সম্ভব, না জাতিগত স্তরে সার্বিক উন্নতি লাভ সম্ভব। এভাবে এগিয়ে যাওয়া বরং আমাদেরকে পরিচালিত করছে/করবে এক অনিবার্য দাসত্বের প্রতি। অস্তিত্বের সঙ্কট যেখানে প্রতিপদে জানান দিয়ে যায়/যাবে আমাদের কৃতকর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে। ভাষিক বিপন্নতায় আক্রান্ত এই শিকড় বিচ্ছিন্ন জীবন (যা বর্তমানে অনেকের জন্যেই প্রায় গর্বের ব্যাপার হয়ে উঠেছে), আমাদের অজান্তেই আমাদের মনন-চিন্তনের জগতে সেই অদৃশ্য শৃঙ্খলটুকু পরিয়ে দেয়, যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজে সম্ভব হয় না। অথবা কখনও কখনও প্রাসঙ্গিক থাকার অদম্য ইচ্ছায় জেনেশুনেই আমরা নিজেরাই সে শৃঙ্খল ধারণ করি। বলা বাহুল্য যে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা, সৃজনশীলতা, হৃদয়াবেগ সমস্তই যেন এক বিরাট অর্থহীনতায় পর্যবসিত। অথচ বাঙালি ঐতিহ্য সংস্কৃতির গৌরবময়তা ছড়িয়ে আছে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতি ছত্রে ছত্রে; আমাদের জীবনে, মননে, বচনে। আমাদের ভাষা, আমাদের আত্মপরিচয়। আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জীবনসুধা। এই সত্য, শাশ্বত ও চিরকালীন।

১৯শে মে'র পুণ্যতিথিতে সজল চোখে, ব্যাথাদীর্ণ হৃদয়ে আমরা স্মরণ করি সেই সব ভাষা-যোদ্ধাদের, যারা আমাদের ভাষিক অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার অটল সঙ্কল্পে প্রাণ বিসর্জনেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আজ সেই উত্তরাধিকার বহন করার গুরুদায়িত্ব আমরা তুলে নিয়েছি নিজেদের উপর। পরিবর্তিত সময়ের দ্রুততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আপন সত্তার রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আমরাও এগিয়ে যাব জীবনপথের পথিক হয়ে। আমাদের ভাষা যেখানে বহন করবে আমাদের অস্তিত্বের গৌরবকে।

## ১৯শে মে ভাষা আন্দোলন : এক রক্তে লেখা ইতিহাস

**পারমিতা দাস চৌধুরী**
প্রাক্তন ছাত্রী

ভাষা মানুষের পরিচয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মাতৃভাষা রক্ষার জন্য মানুষ বারবার জীবন দিয়েছে বরাক উপত্যকায়। **১৯৬১** সালের **১৯শে** মে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন তার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। এই আন্দোলন বাংলাভাষী মানুষের অধিকার রক্ষার এক গৌরবময় অধ্যায়।

স্বাধীনতার পর আসাম রাজ্যে ভাষাগত সমস্যা দেখা দেয়। আসাম সরকার ঘোষণা করে যে অসমিয়া হবে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা। কিন্তু বরাক উপত্যকার শিলচর, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দি অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ বাংলাভাষী। বাংলাভাষীদের ভাষার অধিকার অবজ্ঞা করে অসমিয়া ভাষাকে জোর করে

চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাভাষীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তারা দাবি তোলে বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষাকেও সরকারি মর্যাদা দিতে হবে। ভাষার অধিকারের দাবিতে বরাক উপত্যকায় ছাত্র,শিক্ষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ সংঘটিত হতে শুরু করেন। সংগঠিত হয় 'ভাষা সংগ্রাম সমিতি'। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, ধর্মঘট, মিছিল,সভা ইত্যাদির মাধ্যমে দাবি জানানো হতে থাকে। কিন্তু সরকার তাদের দাবি মেনে নেওয়ার বদলে কঠোর দমননীতির পথ বেছে নেয়।

তারপর আসে সেই রক্তাক্ত দিন। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর রেল স্টেশনে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়। লক্ষ্য ছিল রেল চলাচল বন্ধ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু পুলিশ বিনা উস্কানিতে আন্দোলনরত নিরীহ মানুষের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই নৃশংস হামলায় ১১জন আন্দোলনকারী শহিদ হন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে। তাঁদের আত্মবলিদান বরাক উপত্যকার মানুষের হৃদয়ে অম্লান স্মৃতি হয়ে জ্বলছে।

১৯শে মে-র রক্তাক্ত  ঘটনার পর বরাক উপত্যকা ফুঁসে ওঠে। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে  সরকার শেষ পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকেও সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬১ সালের ২৪শে মে আসাম সরকার ঘোষণা করে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় বাংলা ভাষাও সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে।

আজও ১৯শে মে বরাক উপত্যকায়,'ভাষা শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে শহিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানানো হয়। ১৯শে মে-র ভাষা আন্দোলন আমাদের শেখায় ভাষা শুধু কথা বলার মাধ্যম নয়,তা আমাদের আত্মার পরিচয়, অস্তিত্বের প্রতীক। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতেও পিছপা হওয়া উচিত নয়। ভাষা শহিদদের রক্তে লেখা এই ইতিহাস চিরকাল আমাদের গর্বের ধন হয়ে থাকবে।আমরা কৃতজ্ঞ সেই সকল বীর সন্তানের কাছে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ বাংলাভাষা মর্যাদা পেয়েছে। তাঁদের স্মরণে উচ্চারণ করি,

অমর তোমরা হে চিরজীবি
অমর তোমাদের বলিদান।

## ১৯শে মে-র ভাষাসংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত টীকাকৃত গ্রন্থপঞ্জি

**সঙ্গীতা দাশ তালুকদার**
গ্রন্থাগারিক, রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়

১৯শে মে, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষাসংগ্রামের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে অজস্র গল্প, কবিতা তথা ইতিহাসভিত্তিক গবেষণাধর্মী বই। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগ্রহেও রয়েছে এই সংগ্রামের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ। এখানে রইল তারই মধ্য থেকে কিছু পুস্তকের সংক্ষিপ্ত টীকাকৃত গ্রন্থপঞ্জি।

**১. ভারতের বাংলা ভাষা সংগ্রাম,** কানু আইচ, বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি, ২০০৫। এই পুস্তকে ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র ভাষা আন্দোলনে যে ১১জন শহিদ হয়েছেন তাঁদের আন্দোলনের কথা রয়েছে।

**২. বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস,** সুবীর কর, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯। এই পুস্তকে ভাষাসংগ্রামের পূর্ববর্তী-পরবর্তী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

**৩. ১৯ শে'র স্মৃতিকথা,** সনৎ কুমার কৈরী, ইন্ডিয়া প্রেস, ২০১১। এই পুস্তকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আত্ম-স্মৃতিকথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**৪. শহিদ তর্পণ,** গীতা সাহা, অপর্ণা গ্রাফিক্স, ২০১০। এই পুস্তকে মূলত ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি কবিতা সঙ্কলন।

**৫. উনিশের উত্তরাধিকার,** অনন্ত দেব, শুভম প্রকাশনী, ১৯৯৭। এই পুস্তক ১৯৬১-র ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি প্রতিবেদন।

**৬. আসামে বাংলা ভাষার সংকট,** দিলীপকান্তি লস্কর, লালনমঞ্চ, ২০০২। এই পুস্তক ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি রচনা সংকলন।

**৭. উনিশের কথাসাহিত্য,** লালনমঞ্চ, দিলীপকান্তি, লস্কর, ২০০২। এই পুস্তক মূলত ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত কিছু গল্প এবং উপন্যাস সংকলন।

**৮. ১৯-এর কবিতা ও গান,** দিলীপকান্তি লস্কর, লালনমঞ্চ, ২০০২। এই পুস্তক ১৯শে-র বাংলা ভাষাসংগ্রামের ওপর রচিত কিছু কবিতা ও গানের সংকলন।

**৯. উনিশের কবিতা,** অতীন দাশ, ভিকি পাবলিশার্স, ২০১১। এই পুস্তক বাংলা ভাষাসংগ্রামের ওপর রচিত কবিতার সংকলন।

**১০. ভারতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম : একটি মূল্যায়ন প্রচেষ্টা,** দিলীপকান্তি লস্কর, লালনমঞ্চ, ২০০২। এই বই বাংলা ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিবেদনের একটি সংকলন।

**১১. বাংলাভাষা আন্দোলন ও যুগশক্তি (১৯৬০-৬২),** রণজিৎ চৌধুরী, যুগশক্তি প্রকাশন, ২০০৭। এই পুস্তকটি বাংলা ভাষা আন্দোলনের ওপরে যুগশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলির সংকলন।

**১২. উনিশ আমার উনিশ তোমার,** অতীন দাশ, সেঞ্চুরি লিটারেচার, ২০১৬। এই পুস্তকটি উনিশের ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত সাহিত্যের সংকলন।

**১৩. উনিশে মে'র ইতিহাস,** দিলীপকান্তি, লস্কর, লালনমঞ্চ, ২০০২। এই পুস্তকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের কিছু মূল্যবান নথিপত্র আছে।

**১৪. ভাষা-সংগ্রামে কাছাড়,** অলক রায়, প্রতিমা প্রেস, ১৯৭৩। এই পুস্তকে ভাষাসংগ্রামে বাচ্চু চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা একটি প্রতিবেদন রয়েছে।

উপরোক্ত তালিকায় ১৯শে মে'র ভাষাসংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা মোট ১৪টি বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। আশা করা যায় এই সংগ্রহ বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণায় উৎসাহী গবেষকদের কাজে সাহায্য করবে।

# কবিতা

## বেঁচে থাক ভাষা

**প্রজ্ঞা অন্বেষা**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আমার শহরে খুন হয়েছিল ভাষা
তোমাদের দেশে বর্ণমালার লাশ
একই ইতিহাস, ভূগোলটা পাল্টানো
মানচিত্রেও বড় কাছাকাছি বাস।

পাল্টেছে শুধু দেশ-কাল-পাত্ররা
খুনির চেহারা একই সারা পৃথিবীতে
খুনিরা জানেনা ভাষাকে যায় না মারা
ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের সঙ্গীতে।

ভাষা বেঁচে থাকে বর্ণমালার কোলে
ভাষারা কখনও মুষ্টিবদ্ধ হাত
ভাষা বেঁচে থাকে জীবনের বিনিময়ে
ভাষারা আঁধারে মশাল জ্বালানো রাত।

খুনিদের আজ বলে দাও সোচ্চারে
ভাষার হয়না কোনও সীমা কাঁটাতার
ভাষা বেঁচে থাক বলবার অধিকারে
বেঁচে থাক ভাষা সকলের, সব্বার।

## বাংলা

**সুস্মিতা দাস**
ছাত্রী, চতুর্থ ষান্মাসিক

বাংলা শুধু শব্দ নয়,
বাংলা উচ্চারিত কোন  ধ্বনিও নয়,
বাংলা এক আবেগের নাম।
বাংলা অনুভূতির অন্তরালের ভালোবাসা।

রক্তের বিনিময়ে কেনা ভালোবাসা

এটাই হচ্ছে বাংলা ভাষা।

যে ভাষাতে প্রাণ দিল আমার ভাই,
চণ্ডীচরণ, হিতেশ, কানাই
কুমুদ রঞ্জন, সুনীল বলে
ভাষার  স্বাধীনতা কি আর এমনিতে মিলে?
রক্তের রঙে সজ্জিত হয়ে আমরা বাংলার গান গাই,
শচীন্দ্র, তরণী, বীরেন্দ্র, সুকোমল
ভুলিনি তোমাদেরও ভাই
মৃত্যুকে দেখেও বলেছ তোমরা আমরা বাংলার স্বাধীনতা চাই।

দশ পুরুষের সমতুল্যা বোন তুমি কমলা,
হাসিয়া দিয়াছো প্রাণ
বুক পেতে দিয়েছে বসুন্ধরা।